পুরনো কাসুন্দি!

অরুণকান্তি ঘোষ

[প্রায় সাড়ে তিনদশক ধরে নিয়মমাফিক হিমালয়ের কাহাঁ কাহাঁ মুলুকে ঘুরে বেড়িয়েছি, তখনকার বা সেদিনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার যাবতীয় অপ্রতুলতা অগ্রাহ্য করে। এখনকার ব্যাপার স্যাপার বদলেছে, আজকের পাহাড়িয়া লোকজন প্রযুক্তিগত সুবিধা পায়, একটু বেশিই পায়। তাই আজকাল অভিযানকাহিনীর আঙ্গিক ও প্রকাশ-ভাষা ভিন্ন। এসময়ে তুচ্ছ কিছু পুরনো কথা বলার লোভ হ'ল। অধমের পদযাত্রা জীবনের কিছু নেপথ্য টুকিটাকি...! পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর...]

দিনটা ছিল ১৩ আগস্ট। চাকা গড়ানোর পর বরাবরের সংস্কার-খুঁতখুঁতে গোবিন্দ বলেই ফেলে, 'আজকের দিনে না বেরোলে চলছিল না?' বুঝলাম, সে অশুভ ১৩ নিয়ে চিন্তিত। কিছু বললাম না, চুপ করে বাইরে মেঘ-থমথমে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। উত্তরকাশির বন্দীদশা কেটেছে বটে, মাথার ভিতরে যদি-কিন্তু-অগত্যা ইত্যাদির জটগুলো ছেড়ে যায়নি। অজস্র অনিশ্চয়তার ইশারাগুলো চমক দিয়ে যায় মনে। বাসে আমাদের বাইশজন বেশ চুপচাপ, বাইরেটাও তাই। জানালায় কালোমেঘের নিশ্চল ভেলাগুলো অস্ত্রোপচার-পূর্ব অচেতন রুগীর মতো সার দিয়ে শুয়ে আছে।

ভাটোয়ারি পার হয়ে গাংনানি পর্যন্ত যাত্রা একরকম উপদ্রবহীন। সুখির দিকে মোড় নিতেই রাস্তায় ফাটল, নদীর ধার ঘেঁষে। বাস থেমে গেল। পরিস্থিতি কত গুরুতর তা বোঝার জন্য রাস্তায় নামতে হ'ল। যেভাবে ফাটলগুলো হাঁ করে আছে, চলতে গেলে দুধারের চাকা শূন্যে ঝুলবে। ব্যাপার বেশ ভয়াবহ। আশু কোনও সুরাহার সম্ভাবনা নেই। অগত্যা টোটকার আশ্রয় নিতে হয়। এখানে ওখানে বিস্তর ধস-নির্গত পাথর পড়ে আছে, বাইশজনে মিলে হাতে হাতে রিলে প্রথায় পাথর ফেলতে থাকি ওই হাঁ-গুলোতে। ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে হাঁ-গুলো সামাল দেয়া গেল বটে; কিন্তু ভেবে পাই না ওরকম পলকা জোড়ের ওপর দিয়ে চাকা গড়াবে কীভাবে। বাস পুরোপুরি খালি করা হ'ল। যাত্রী, মালপত্র, ছাদে আমাদের বিশাল লটবহর সব নামিয়ে ড্রাইভার একা বাসটিকে পাইলটিং করে নিয়ে যায়। মোচার খোলার মতো টাল খেতে খেতে সেটি পার হয়।

একই কৌশল বজায় থাকে হরশিলে, লঙ্কা সেতু পেরিয়ে। এরইমধ্যে যে কী পরিমাণ আতঙ্ক দুর্ভোগের সমাহার ঘটল তার ইয়ত্তা নেই। তবু যাওয়াটা জারি থাকে। অবশেষে দুপুর তিনের একটু আগে সবাই গঙ্গোত্রী পৌঁছোই অক্ষত দেহে। রাস্তার একধারে গোটা সংসার সার দিয়ে সাজিয়ে ওধারে নদী-পানে ঝুঁকে থাকা ভাতের হোটেলে ঢুকে পড়ি। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। যত দ্রুত সম্ভব ভাত-রুটি-দই-রাজ্‌মা

দিয়ে যথেচ্ছ উদরপূর্তি করি। ঢেঁকুর তুলে বাইরে চোখ রাখতেই বুঝি, দিনের আলো নিভে আসছে। মেঘ বেশ ভারি হয়েছে। তবু ভালো যে এখনও সে বাড়াবাড়ি করেনি।

বেশ কয়েকজন বললে, রাতটা গঙ্গোত্রীতেই কাটুক। প্রবীণতম অশোকদাও বললে, এই ওয়েদারে গঙ্গোত্রী-ই সেফ। রণবীরের (গাইড) সাথে কথা বললাম, সিদ্ধান্ত হ'ল আমরা হাঁটব, চিরবাসা পর্যন্ত। উত্তরকাশিতে দিন নষ্ট হয়েছে অনেক, এরপর আর আয়েশ করার জায়গায় নেই আমরা। অতএব স্যাক কাঁধে চাপল, বাকি লট-বহর ভাগাভাগি হয়ে চেপে গেল নেপালি ভাইদের ঘাড়ে। আমরা মন্দিরগামী রাস্তায় না গিয়ে সরাসরি ওপরে পাহাড়ের কোমরজড়ানো রাস্তাটা ধরি, এটিই ভূজবাসার দিকে যায়। যাক, পায়ে পায়ে কালিন্দীর পথে যাওয়া শুরু হ'ল। কিছুদূর গিয়ে আবিষ্কার করি, আমরা মন্দির ফেলে এসেছি। নিচে তার গম্বুজ, পতাকা দেখা যাচ্ছে। যারা দেবীদর্শন মিস করল তারা দূর থেকে প্রণাম-কথা আউড়ে গেল মনে মনে। যেতে যেতে ঘুরে যুক্তকরে থেমে রইল কিছুক্ষণ। এবং তখনই শুরু হ'ল টিপটিপ। মিনিট পাঁচের মধ্যে প্রবল ঝমঝম। রেনকোট বা পঞ্চু, হাতের কাছে যার যা ছিল চাপিয়ে নিয়েছে। এবার একরকম অন্ধের মতো পথ চলা। একে দিনের শেষ, তারওপর ওই উজাড় করা বর্ষণ, রাস্তার দাগটুকুও দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াচ্ছে স্রোত। এভাবে আর কতদূর।

চলতে চলতে চাপটা ক্রমশ বাড়ছে। কেননা সঙ্গীরা রীতিমতো সরব। তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে, রাতটা গঙ্গোত্রীতে থেকে যাওয়াই ঠিক ছিল। সত্যি। পরিস্থিতি এত বিরুদ্ধে যাবে আমার ধারণায় ছিল না। এখন চলা ছাড়া খুব কিছু করার নেই। সামনে একটা সুবিধাজনক আস্তানা জুটলেই আজকের মতো থামা। এমুহূর্তে দূরের চিন্তা অনর্থক, তবু চিন্তাটা এসেই গেল। এতদিনের প্রস্তুতির ওই মহাসমারোহ সব বুঝি জলের তোড়ে ভেসে যাবে। অশোকদা কথাটা বলেই ফেলে, 'আমাদের ফিরতে হবে।' অভিজ্ঞ দু-চারজন সেই কথার প্রতিধ্বনি করে।

ঘন্টা দুইয়ের অসম লড়াই শেষে জোর ৩ কিমি রাস্তা হেঁটেছি। থামতে হ'ল। সামনে রাস্তা বন্ধ, বাঁয়ে পাহাড়ের গালি দিয়ে তেজি একটা স্রোত নামছে, সেটি ঝাঁপ দিয়েছে ডাইনে গঙ্গার বুকে। এটি দেবগঙ্গা। সাধারণ সময়ে বেশ নিরীহ একটি নালা, কিন্তু এখন বৃষ্টির জলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। পারাপারের সাঁকোটা-ও জলের তলায়। কী করা? টর্চের আলো একটু ওপরদিকে দুটি পাইনের গুঁড়ি খুঁজে পায় – নালার ওপর দিয়ে পাশাপাশি পাতা আছে। পা দিয়ে বুঝলাম, ব্যাপার বেশ নড়বড়ে, তবু এটাই ওপারে পৌঁছনোর একমাত্র উপায়। অবিশ্বাস্য এক ঝমঝমের মধ্য দিয়ে গোটা দল ব্যালান্সের পরীক্ষা দেয় একে একে। সবাই নিরাপদে এবং সসম্মানে উতরেও যায়। দেবগঙ্গা পেরিয়ে উর্ধগামী রাস্তাটা আবার পেয়ে যাই। হালকা চড়াই ভাঙতে ভাঙতে টের পাই, দিনমানে রাত নেমছে, তবে বর্ষণের ধার কমছে। খানিক ওঠার পর বিরতির মতো একফালি জায়গা। রাস্তার দুই-ধারে টিন-কাঠ-পলিথিনে তৈরি দুটি ঝুপড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দিকটা হাট করে খোলা, পাথরে ঘেরা ভিতরের মেঝেটা বিঘতখানেক উঁচু করা। দুটি ঝুপড়িই এই মুহূর্তে মালিকানাহীন। মনে পড়ল, এখানে বিশেষ সময়ে তীর্থযাত্রীদের জন্য অস্থায়ী পরিষেবা চালু থাকে। এখন যাত্রার মরশুম নয়, তাই খালি। যাক, আমাদের কাছে এই দুটিই পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো। অতএব, রাতটা এখানেই কাটুক।

সেই রাতে মুখোমুখি দুটি চালাঘরে কীভাবে সংসার পেতেছিলাম সেই গল্পটা থাক। এটুকু বলতে পারি যে চালা দুটোর একটিও নির্ভরযোগ্য ছিল না। দলের ও আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব পলিশিটগুলো

দিয়েও বিশেষ সামাল দেওয়া যায়নি নৈশ দুর্যোগ। অবশ্য মাঝে বৃষ্টি একেবারেই থেমে গিয়েছিল। সেই অবসরে আশা স্বস্তি জেগেছিল দলে, নেপালি ভাইয়েরা জোড়া স্টোভ জ্বালিয়ে বেশ জমিয়ে খিচুড়ি পকোড়াও পাকিয়েছিল। কিন্তু রাত বাড়তেই বিকেলের রিপিট শো দেখলাম, আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। ঝুপড়ির ভিতরে জায়গা বিস্তর ছিল; কিন্তু যত্র-তত্র জল দাঁড়িয়ে থাকায় জনা দশের বেশি স্লিপিং ব্যাগ পাতার জমি পেল না। বয়স্ক ও ঘুমকাতুরেদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হ'ল আগে, বাকিরা কোনওমতে মালপত্তরের গায়ে আধশোয়া হ'ল। বলাবাহুল্য রাতটা একরকম জেগেই কাটল। ঝড় নয়, ঘন ঘন বাজ পড়া নয়, শুধুমাত্র বৃষ্টি যে অমন মানসিক নিপীড়নের কারণ হতে পারে - জানা ছিল না। অশোকদার কথাটা বার বার কানে চেতাবনি দিতে থাকে, 'আমাদের ফিরতে হবে!'

ভোর রাতে মনে হ'ল, আকাশ একটা বিরতি দিতে যাচ্ছে। বাঁয়ের চালার একপাশে একটা বস্তায় ঠ্যাসান দিয়ে ছিলাম। দেখলাম, উলটোদিকে একফালি ফাঁকা জমি, সামান্য ঝক্কি পোহালে স্লিপিং ব্যাগটা পাতা যায়। নিঃশব্দে কাজটা সারি, এবং শুয়ে পড়ি। দুমিনিটের মধ্যে আমি আর কিছু টের পাই না। সটান ঘুমের দেশে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, বিকাশের (পুরনো সাথী) ডাকে মমি-দশা ছেড়ে উঠে বসি। ঘড়িতে সাড়ে ছয়। শুনলাম, এর আগে ভ্রান্তি-সুরজিৎ-অনির্বান পালা করে ডেকে গেছে। আমি নাকি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিলাম। তা হবে। কিন্তু বিষয় কী? সাতসকালে এই ডাকাডাকি! বৃষ্টি ক্ষান্ত দিয়েছে, মেঘ জমাট বেঁধেছে ঢের অধিক। সবাই বুঝি এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়তে চায় ভুজবাসার দিকে। আসলে তা নয়। বিকাশ যেকথা বললে তাতে ঘুমিয়ে যেটুকু শান্তি সঞ্চয় হয়েছিল, সব মুহূর্তে উবে গেল। শুনলাম, অশোকদা নিজের স্যাক গুছিয়ে তৈরি হয়ে আছে, আমাকে একবার বলেই রওনা দেবে গঙ্গোত্রী ছুঁয়ে উত্তরকাশির দিকে। ওঁর সঙ্গী হয়েছে শ্যামল (দত্ত) ও আরও দুজন। আর যারা এখনও সামনে যাবে বলে বুক বেঁধে আছে তারাও অভাবনীয় দোটানার শিকার হয়ে অস্থির পায়চারি করে যাচ্ছে। যা শুনছি, সবটা মাথার ভিতরে ঠিক গুছিয়ে নিতে পারছি না। বিকাশ বেশ রেগেই বলে, 'আপনি এখনও চুপ করে বসে! যান, ওদের আটকান। নইলে সব আপসেট হয়ে যাবে।' হ্যাঁ, তাই তো।

ওপারের চালার নিচে তখন শব্দহীন অস্থিরতা। দলের অন্যতম সিনিয়র শ্যামল (দত্ত) ইতিমধ্যে স্যাক কাঁধে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে ওয়ার্ম-আপ শুরু করে দিয়েছে। অশোকদা-ও রেডি, শুধু স্যাক তুলে রওনা দেওয়ার অপেক্ষা। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।' বললাম, 'এসব কী হচ্ছে?'

'যা হবার তাই হচ্ছে। আমরা উত্তরকাশিতে ওয়েট করছি, তোমরাও এসো পিছনে।' নির্বিকার স্বরে বলে অশোকদা।

'অশোকদা, দল সামনে যাবে, পিছনে নয়। এতদিনের এতকিছু দুদিনের বৃষ্টিতে ভেসে যেতে দেব?'

'এটা দুদিনের ব্যাপার নয়, তুমিও জানো। কী হতে যাচ্ছে সেটা আমি উত্তরকাশিতেই বুঝে গেছি, তবু তোমাদের, বিশেষ করে তোমাকে ডিসকারেজ করতে চাইনি। চুপ করে ছিলাম। এখন আমি নিশ্চিত, আকাশ পিছু ছাড়বে না।'

বলে অশোকদা থামে। শ্যামাল তেমনই স্যাক-কাঁধে পায়চারি করতে করতে বলে, 'আজ এখনই ডিসিশন নাও, ট্রেক বন্ধ থাক।' ওর কথার উত্তর না দিয়ে অশোকদা-কে বললাম, 'দেখ, এখন কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না,

অনেকক্ষণ হচ্ছে না।'

'হচ্ছে না, হবে। এই আকাশ মাথায় করে তুমি বড়জোর গোমুখ পর্যন্ত যেতে পারবে, তারপর? গঙ্গোত্রী বা চতুরঙ্গী গ্লেসিয়ারে মার্চ করতে পারবে? সেটা সুইসাইডাল হবে।'

'ঠিক। কিন্তু গোমুখ পর্যন্ত যেতে পারব তো? তার মধ্যে আকাশের ভাবগতিক আরও পরিষ্কার হবে। তখন সবাই মিলে একসাথে সিদ্ধান্ত নেব। ফেরার হলে গোটা দল একসাথে ফিরবে। কিন্তু এভাবে যেও না। কালিন্দী বাতিল করার আগে আর একটু লড়তে দাও। তারপর যদি ফিরেও যাই, সবাই জানবে, ওরা অন্তত চেষ্টা করেছিল।'

'চেষ্টা কর। আমি তো বারণ করছি না।'

'তুমি দলে সিনিয়র-মোস্ট। তোমার ডাকে আমার প্রথম পাহাড়ে যাওয়া। তাই চেষ্টাটা তোমাকে নিয়েই হবে, সবাইকে নিয়ে হবে।

দেখে মনে হ'ল, অশোকদা নিমরাজি। বলে, 'বলছ, যাব। দেখো, সেই ফিরতে হবে, দুদিন আগে আর পরে।' তা হোক। তবু দলের অন্দরের মেঘ একরকম সামাল দেওয়া গেল। এরপর একটুও দেরি চলে না, হেঁকে বলা হ'ল, 'আজ ব্রেকফাস্ট বন্ধ, এখখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।' আধঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়াও গেল। কী আশ্চর্য, তখনই বৃষ্টি নামল জাঁকিয়ে! আর কী করা? পঞ্চু রেনকোট ইত্যাদি চাপিয়ে নিল যে যার মতো। চলা জারি থাকে। চলতে চলতে আকাশভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যাতীত এক আক্রোশ কাজ করে মাথার ভিতরে। কে যেন একচুমুকে সাগরের জল শুষে নিয়েছিল! যদি পারতাম, মাথার ওপরের সর্বনাশা শামিয়ানাটা একটা ফুঁয়ে নিকেশ করে দিতে...! অশোকদা হাঁটছিল পাশে। একসময় বিষন্ন চোখে হাসে। নিষ্ফলা ক্রোধে আমার চোখে জল আসে।

বৃষ্টি মাথায় করে চিরবাসায় পৌঁছে যাই। ভাগ্যি ভালো যে দোকানপাট খোলা ছিল, উনুন জ্বলছিল। ওখানে ভারি ব্রেকফাস্ট সেরে হাঁটা দিই ভুজবাসার দিকে। শেষের দিকে বড্ড জোরে হেঁটেছি। সেই গতি নিজেকেই অবাক করেছে। আরও যেটা অবাক করল, তা হ'ল, ভুজবাসা পৌঁছতেই সব শান্ত। নিচের বিশাল বেসিনের এককোণে আই-টি-বি-পি ছাউনির পাশে আমাদের তাঁবু পড়ছে রণবীরের নেতৃত্বে। ওপর থেকে দুয়েকবার হাঁকলাম ওদের উদ্দেশ্যে। সাড়া নেই। আসলে আমার হাঁক ওখানে পৌঁছচ্ছে না। রাস্তার পাশের চটিতে একজন বসেছিল, চেনা অথচ খেয়াল করিনি। সে-ই ডাকে আমায়, 'পোঁহোছ গায়ে, লিডারসাব?' আরে এ-তো বিষাণ! কোন ফাঁকে সে আমাদের টেক্কা দিয়ে চলে এলো?

বিষাণ আমার হাতে পারমিশনের ফাইলটা তুলে দেয়। বলছে, 'আব মুশকিল আসান।' তখনই দূরের দিকে চোখ চলে যায়। গোমুখের বিখ্যাত হাঁ-গুলো দেখতে পাচ্ছি। ঠিক ওপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের পিছনে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, বিস্ময়কর চালচিত্র! তার ওধারে রাজকীয় ভঙ্গীমায় আসীন ভাগীরথী পর্বতেরা। এ দৃশ্য কি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের ইশারা? কে জানে।

খানিক পর অশোকদা এসে পাশে দাঁড়ায়, ঠিক ওখানেই। আমি কিছু না বলে মেঘের ফাঁকে জেগে থাকা ভাগীরথীদের দেখাই। অশোকদা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পরের দিন ছিল ১৫ আগস্ট। আই-টি-বি-পি'র জওয়ান অফিসাররা মিলে সামরিক কায়দায় তেরঙ্গা পতাকা তোলে। আমরা সদলে ওদের উদযাপনে যোগ দিই। ছোট্ট অনুষ্ঠান শেষে ওদের শুভেচ্ছা নিয়ে ওখান থেকেই রওনা দিই গোমুখের দিকে। যেতে যেতে লক্ষ্য করি, আমাদের দিকে অপলক চেয়ে আছে ভাগীরথী, শিবলিঙ, সুদর্শন। সবাই আগলছাড়া রোদে ঝলমল করছে! সেদিনই আমরা গোমুখ ছাড়িয়ে গঙ্গোত্রী ও চতুরঙ্গী সঙ্গমে ঝুঁকে থাকা নন্দনবনের তেপান্তরে তাঁবু ফেলেছি।

না, সে-যাত্রায় কালিন্দী গিরিবর্ত্ম শিরে পৌঁছনোর আগে আর একফোঁটা বৃষ্টিও ঝরেনি।